The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIX (Issue 2), 2023 (pp.15 - 28)
Published in December, 2025

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা প্রবণতা বিশ্লেষণ: একটি সমীক্ষা

ড. আকিকুল হক*

প্রতিপাদ্যসার: আত্মহত্যার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত নৈতিক বিতর্ক প্রাচীন গ্রিক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত চলে আসছে। প্রায় সব ইউরোপিয়ান দার্শনিকেরা আত্মহত্যাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক সমস্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যা কেবলমাত্র তখনই নৈতিক সমস্যা হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে যখন সেটি প্রত্যেক চিন্তাশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত সুশীল সমাজকে ভাবিয়ে তোলে, তাঁদেরকে উদ্বিগ্ন ও শংকিত করে। এ জাতীয় সমস্যাগুলো সমাজ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়। তাই সমাজ সচেতন সুশীল সমাজ অনতিবিলম্বে এগুলোর হাত থেকে মুক্তি পেতে চায় এবং দ্রুত এগুলোর প্রতিকার আবশ্যক মনে করে। আত্মহত্যাকে একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে দেখা হয়। আমরা যদি আত্মহত্যার কারণসমূহ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে সেখানেই এর প্রতিকার খুঁজে পাই। অতএব, এ সমীক্ষার মাধ্যমে পাঠকের সামনে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মহত্যা রোধ করা সম্ভব। তাই প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা প্রবণতার নৈতিক দিক বিশ্লেষণ এবং এ থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা সম্পর্কে আলোকপাত করা।

নির্যাস শব্দগুচ্ছ: আত্মহত্যা, নৈতিক বিশ্লেষণ, গবেষণা জরিপ, সুপারিশমালা।

ভূমিকা

আত্মহত্যা (Suicide) এক প্রকার সামাজিক ব্যাধি। পৃথিবীতে এমন কোনো সমাজ পাওয়া যাবেনা যেখানে আত্মহত্যা সংঘটিত হয়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, প্রতি চল্লিশ সেকেন্ডে বিশ্বের কোথাও না কোথাও কেউ না কেউ আত্মহত্যা করছেন। কেবল ২০১২ সালে আত্মহত্যা করেছেন আট লাখ মানুষ। আত্মহত্যা সব যুগেই একটা গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সমস্যা হিসেবে বিরাজমান ছিল। প্রাচীন গ্রিক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আত্মহত্যার অনুমোদনযোগ্যতা সম্পর্কিত নৈতিক বিতর্ক চলছে। এটি এখন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক সমস্যা হিসেবে স্বীকৃত। আত্মহত্যা হচ্ছে আত্মবিনাশ, আত্মহনন ও আত্মবিলোপ। কোনো ব্যক্তি যখন ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তানুসারে স্বেচ্ছায় এবং স্ব-দায়িত্বে নিজেই নিজের জীবনের অবসান ঘটায় তখন তাকে আত্মহত্যা বলে। এটি একটি বিভ্রান্তিকর ও অসংলগ্ন পরিস্থিতি। কারণ অন্যান্যরা আত্মহত্যাকারীর মানসিক জগৎ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা এবং এটি কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই ঘটে যায়। আত্মহত্যা সম্পর্কে দুরখেইম বলেন, আত্মহত্যা হচ্ছে আত্মঘাতীর নিজের সদর্থক অথবা নঞর্থক কর্মকান্ড থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভূত মৃত্যু এবং এক্ষেত্রে আত্মঘাতী তার কর্মকান্ডের ফল যে মৃত্যু তা আগে থেকেই জানবে।

আত্মহত্যা হচ্ছে ব্যক্তি যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছানুসারে, কারো দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে এবং সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে (অর্থাৎ সে যা করতে যাচ্ছে তার ফল যে নিশ্চিত মৃত্যু তা সে জানে), অন্য কারো সহযোগিতা না নিয়ে, নিজেই নিজের জীবনের অবসান ঘটায় তখন তাকে আত্মহত্যা বলে।

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তথা তরুণ সমাজ জাতির ভবিষ্যৎ কান্ডারি। তারাই আগামী দিনে রাষ্ট্রের হাল ধরবেন। তাই তাদের মানসিক সুস্থতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ার জন্য তাদের পর্যাপ্ত অনুপ্রেরণা প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের রয়েছে বিরাট ভূমিকা। দেখা যাচ্ছে, আমাদের

* প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাব্যবস্থায় নিচের দিকে বহু শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে ছাত্রজীবন থেকে। আর ওপরের দিকে অনেকে একেবারে ইহজীবন থেকেই চিরতরে ঝরে পড়ছেন আত্মহত্যার মাধ্যমে। দুটোই আমাদের দেশ ও জাতির জন্য খুবই উদ্বেগজনক।

নৈতিক দিক থেকে যদি আত্মহত্যাকে সমর্থন দেওয়া যায় তবে সমাজে একটা বিশৃঙ্খলা অবস্থার সৃষ্টি হবে। তাই নীতিবিদগণের পরামর্শ এই যে দুঃখ-দুর্দশা, দারিদ্র্য-হতাশা, জ্বালা-যন্ত্রণা এগুলি মানুষের জীবনে আসবেই। এরূপ প্রতিকূল অবস্থা যখন সামনে এসে দাঁড়ায় তখন বিচলিত না হয়ে, ভাবাবেগ দ্বারা তাড়িত না হয়ে বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সেগুলোকে সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে। মানুষ শুধু নিজের জন্য বাঁচে না বরং সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্য মানুষের দায়িত্ব রয়েছে এবং সমাজে একজন মানুষের সাথে আরো অনেকে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং নির্ভরশীল তাই কেউ আত্মহত্যা করলে তার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্যরাও গভীর বিপদে পড়ে এবং শোকে ব্যাকুল হয়, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। তাই নৈতিক দিক থেকে আত্মহত্যাকে কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না। বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আত্মহত্যার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালানো। সাথে সাথে তাদের মাঝে এই বোধ সৃষ্টি করা যে, আত্মহননের পথ বেছে না নিয়ে বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে সকল সমস্যা সমাধানের এবং দুঃখ-দুর্দশা তাড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করলে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন অনেক বেশি সুন্দর হবে।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মহত্যার বর্ণনা:

ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন আত্মহত্যা অনুমোদনযোগ্য নয় তেমনি মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এটা স্বীকৃত নয়। প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সের আইনে আত্মহত্যাকে অমানবিক বলে তুলে ধরা হয়। প্লেটো আত্মহত্যা সম্পর্কে বলেন, সক্রেটিস মনে করতেন যেহেতু মানুষ দেবতার সম্পদ, সেহেতু আত্মহনন দেবতার ভয়ানক রোষ বয়ে আনে। তাই আত্মহত্যা করা উচিত নয়। প্লেটো আরো মনে করেন, চরম দুঃখ-দুর্দশা, অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতির উপায় হিসেবে আত্মহত্যা গ্রহণযোগ্য (Plato)। এরিস্টটলের মতে আত্মহত্যা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি এটিকে কাপুরুষোচিত কাজ, রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপন্থি এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক ধরণের অপরাধ বলে গণ্য করেন। তিনি '*The Nicomachean Ethics*' এর নবম পুস্তকে আত্মহত্যার বিরোধিতা করেন এবং পঞ্চম পুস্তকে ন্যায়পরতার আলোচনা প্রসঙ্গে একে অন্যায্য বলে উল্লেখ করেন (Aristotle)। তাঁর মতে, আত্মহত্যা নিজের দেহের ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে করা হয়। এটি দেশের প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধ কাজ। আত্মহত্যা শুধু অন্যায্যই নয়, বরং রাষ্ট্রীয় আইনের লংঘনের শামিল। তাই আত্মহত্যা থেকে সকলের বিরত থাকা উচিত। আবার রোমান দার্শনিক সেনেকা আত্মহত্যাকে অনুমোদন দিয়েছেন। তাঁর মতে আত্মহত্যা একজন বৃদ্ধ মানুষকে দুঃখ-কষ্টভোগ ও বার্ধক্যের ক্ষয় থেকে নিষ্কৃতি দেয়। তবে আত্মহত্যাকে সমর্থন করলেও তিনি মনে করেন, সাধারণত মানুষের কর্তব্য হলো সমাজের অন্যান্য মানুষের [যেমন, সন্তান, স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন] মঙ্গল সাধনের জন্য বেঁচে থাকা (বারি ৩২৫)।

আত্মহত্যা সম্পর্কে মধ্যযুগীয় বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ববিদগণ বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ধর্মযাজক সেন্ট অগাস্টিন। তাঁর মতে আত্মহত্যা অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজ। তিনি মনে করেন, যে ব্যক্তি নিজেকে পাপমুক্ত করতে আত্মহত্যা করে সে বরং নিজেই এক নিকৃষ্ট পাপের জন্ম দেয়। কারণ আত্মহত্যা স্বয়ং তাকে পাপের জন্য অনুতাপের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে (Kastenbaum 197)। অন্যদিকে সেন্ট টমাস একুইনাস আত্মহত্যাকে সমর্থন করেননি। তাঁর মতে, আত্মহত্যা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা, প্রাকৃতিক নিয়ম ও মানুষের নিজের বদান্যতা দেখানোর বিরোধী। আত্মহত্যার ক্ষেত্রে মানুষ তার স্বীয় অবদান থেকে সমাজকে বঞ্চিত করে এবং ঈশ্বরের কাজ নিজ হাতে তুলে নেয়। তাঁর মতে প্রতিকূল পরিবেশ থেকে মুক্তির জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়া অন্যায় ও মানব ধর্মের পরিপন্থি (খালেক ২১৫)।

আত্মহত্যা প্রসঙ্গে আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম তাঁর *Essay on Suicide* গ্রন্থে বলেন, জগতে মানুষের জীবন একটি ঝিনুকের জীবনের চেয়ে মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয় (Hume 406)। হিউম মনে করেন কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে সমাজের জন্য অতিরিক্ত বা বোঝা মনে করেন এবং সে নিজেকে সমাজ থেকে বাদ দিলে সমাজের কোনো ক্ষতি হবে না, তখন আত্মহত্যা অন্যায় বলে গণ্য হবে না। আধুনিক যুগের অন্যতম অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন লক আত্মহত্যাকে অনুমোদন দেননি। লক মনে করতেন যে মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট সম্পত্তি। তাই, তারা স্বাধীন হলেও তাঁর সম্পত্তি বিধায় স্বাধীন ইচ্ছায় এ সম্পত্তি হস্তান্তরযোগ্য নয়। অতএব, আত্মহত্যা ঈশ্বরের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপের নামান্তরমাত্র (খালেক ২১৬)। জার্মান নীতিদার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট আত্মহত্যাকে অনৈতিক ও অন্যায় বলে অভিহিত করেন। তিনি তাঁর শর্তহীন আদেশের (Categorical Imperative) আলোচনার ক্ষেত্রে নৈতিকতার তিনটি মূলনীতির ব্যাখ্যায় আত্মহত্যার দৃষ্টান্তের সাহায্যে একটি নীতি ব্যাখ্যা করেন। কান্টের মতে, একটি নীতি কেবলমাত্র তখনই নৈতিক হবে যদি তাকে সর্বজনীন নীতি হিসেবে পরিণত করা যায় (Kant 8-15)। আমাদের এমন কাজ করতে হবে যা সকলের করা উচিত। কিন্তু আত্মহত্যা কখনো একটি সর্বজনীন নীতি হিসেবে সকল মানুষের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই, কান্টের মতে আত্মহত্যা অন্যায়। আবার, কান্ট এর দ্বিতীয় নীতিবাক্যটি হলো- "তুমি এমন কাজ করো যাতে তোমার নিজেকে বা অন্য কোনো মানুষকে কোনো মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ না করে, সবসময় উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়" (কান্ট ৯৮)। এখানে কান্ট মানুষকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করতে বলেছেন, উপায় হিসেবে নয়। আত্মহত্যা মানুষের দায়িত্বহীনতা নির্দেশ করে। এই দায়িত্বহীনতার পরিচয় মানবতার সাথে সাংঘর্ষিক।

দুঃখবাদী দার্শনিক শোপেনহাওয়ার আত্মহত্যাকে একটি ভ্রান্তি বলে অভিহিত করেন। কারণ এটি মানুষকে দুঃখ-কষ্ট থেকে সত্যিকার অর্থে মুক্তি না দিয়ে শুধু সাময়িক মুক্তি দিয়ে থাকে। আবার একই সময়ে তিনি আত্মহত্যা যে পাপ বা অপরাধ, এ মতের জোরালো বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, আত্মহত্যাকে অপরাধ মনে করা যথারীতি অযৌক্তিক, কারণ এই বিশ্বজগতে এমন কোনো কিছুই নেই, যার ওপর কারো স্বীয় জীবন ও দেহের চেয়ে অধিক অধিকার আছে (বারি ৩২৬-৩২৭)। আত্মহত্যা সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী এমিলি দুরখেইম ১৮৯৭ সালে *সুইসাইড* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে সমাজ সঠিকভাবে প্রতিটি মানুষের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কিন্তু সমাজের প্রতিটি মানুষের কাজ করার অবাধ স্বাধীনতা আছে। যেকোনো কাজ তারা স্বাধীনভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে সফল না হলে ক্ষোভ, দুঃখ, অনুশোচনা ও হতাশায় সমাজের ওপর থেকে আস্থা হারায় ও আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় (খালেক ২২১)। অন্যদিকে, আত্মহত্যা সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানী সিগমন্ড ফ্রয়েড মনে করেন মানুষের জৈবিক চাহিদাগুলোর মধ্যে একটি হলো তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করার বাসনা। আত্মহত্যাকারী স্বেচ্ছায় নিজের জীবনাবসান ঘটায়। সে আত্মহত্যার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে হত্যার প্রতীকী ভূমিকা পালন করে। আত্মহত্যার মাধ্যমে সে অন্যের প্রতিনিধিত্ব নষ্ট করতে চায়।

খ্রিষ্ট ও ইহুদি ধর্ম মতে আত্মহত্যা পাপ। এদের মধ্যে ক্যাথলিক ধর্ম যাজক সম্প্রদায় আত্মহত্যাকে পাপ বলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাচীন হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণগণ আত্মহত্যাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এর স্বপক্ষে যুক্তি হলো- হিন্দুধর্মে দীর্ঘদিন যাবত সতিদাহ প্রথার প্রচলন। বর্তমানকালেও কখনো কখনো কোনো কুসংস্কারযুক্ত সমাজে এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায়। প্রাচীন ও নব্য টেস্ট্যামেন্টের কোনটাই আত্মহত্যাকে পাপ বলে গণ্য করেনি। কিন্তু ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যাকে মানব হত্যার চেয়েও জঘন্যতম পাপ বলে অভিহিত করা হয় (Kastenbaum 200)।

সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত আত্মহত্যার বিবরণঃ

বিশ্বায়নের এ সময়কালে বাংলাদেশে বহুমুখী উন্নয়ন হচ্ছে। কিন্তু প্রযুক্তি ও প্রতিযোগিতার ভিড়ে মানুষকে গ্রাস করছে বিষণ্নতা। মানুষ হয়ে পড়ছে নিঃসঙ্গ ও অসহায়। বিশেষত তরুণ সমাজের মধ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে সমস্যা দেখা দিচ্ছে বেশি। কমিউনিটি, স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি দেশের পাবলিকসহ উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মহত্যার হার উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৯ সালে আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল ১০ হাজার; পরের বছর তা বেড়ে ১৪ হাজারেরও বেশি হয়। দুই বছরের হিসাব অনুযায়ী, আত্মহত্যাকারীর এই সংখ্যা করোনার মৃত্যুকেও ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে বিশেষ করে বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ-তরুণীদের মধ্যে উদ্বেগজনকভাবে আত্মহত্যার হার বেড়েই চলেছে। আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২২ সালে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৫৩২ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। তাদের মধ্যে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে ৪৪৬ জন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৬ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। স্কুল ও সমমান পর্যায়ে ৩৪০ জন এবং কলেজ পর্যায়ে ১০৬ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৪ জন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। ১০৫টি জাতীয়, স্থানীয় পত্রিকা এবং অনলাইন পোর্টালে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে ৯ই সেপ্টেম্বর ২০২৩ প্রকাশিত প্রতিবেদনে আঁচল ফাউন্ডেশন সংস্থাটি জানায়, ২০২৩ সালের জানুয়ারী থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত এই ৮ মাসে ৩৬১ জন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। গত ৮ মাসে গড়ে প্রায়ই ৪৫.১৩ জন আত্মহত্যা করেছে। যেখানে স্কুল শিক্ষার্থী ১৬৯ জন, কলেজ শিক্ষার্থী ৯৬ জন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ৬৬ জন এবং মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ৩০ জন। ৩৬১ শিক্ষার্থীর মধ্যে পুরুষ শিক্ষার্থী ১৪৭ জন এবং অন্যদিকে নারী শিক্ষার্থী ২১৪ জন।

স্কুল =৪৬.৮১%   কলেজ= ২৬.৬০%   বিশ্ববিদ্যালয়= ১৮.২৮ %   মাদ্রাসা= ৮.৩১%

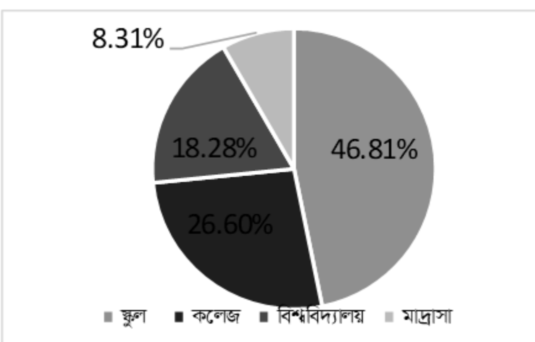

বিভিন্ন ক্যাটাগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আত্মহত্যার অনুপাত (সময়কালঃ জানু-আগস্ট ২০২৩)

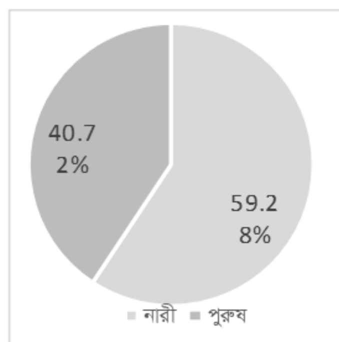

নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত

একই সময়ে ২০২২ সালে আত্মহত্যা করে ৩৬৪ জন শিক্ষার্থী। আত্মহত্যাকারীদের বয়সভিত্তিক বিবেচনায় দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা করেছে ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী শিক্ষার্থী ৬৭.৩%। তাদের মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ১৫৯ জন, অন্যদিকে পুরুষ শিক্ষার্থী ৮৪ জন আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। ২০ থেকে ২৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার হার ২১.৬০%। আরও উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে এ সময়ে ১ থেকে ১২ বছর বয়সী ৩০ জন আত্মহত্যা করেছে যার হার হচ্ছে ৮.২৪%। জরিপে দেখা গেছে আত্মহত্যাকারী স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং ঢাকা বিভাগে এর হার বেশি (ফাতেমা ৯)।

একনজরে, ১-১২ বছর শিক্ষার্থী	= ০৮.২৪%
১৩-১৯ বছর শিক্ষার্থী	= ৬৭.৩০%
২০-২৫ বছর শিক্ষার্থী	= ২১.৬০%
	= ৯৭.১৪%
অন্যান্য বয়সী শিক্ষার্থী	= ০২.৮৬%
মোট	= ১০০%

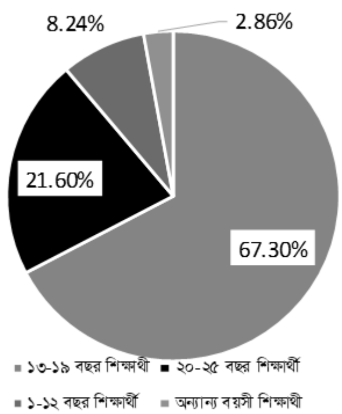

[তথ্যসূত্র: আঁচল ফাউন্ডেশন ২০২৩]
[কৃতজ্ঞতাস্বীকার: তানসেন রোজ, সভাপতি, আঁচল ফাউন্ডেশন]

প্রকৃতপক্ষে আত্মহত্যা একটি ব্যাধি। যে বিজ্ঞান সমাজের অস্বাভাবিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে তাকেই সামাজিক ব্যাধি-বিজ্ঞান (Social Pathology) বলে। সামাজিক ব্যাধি বলতে বোঝায় সামাজিক অকল্যাণ (social evils) যা সমাজের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থাকে ব্যহত করে। মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাবোধের অভাব ও হীনমন্যতার অনুভূতি, মানুষের আচরণের মধ্যে অস্বাভাবিকতা ও সংগতিহীনতা বর্তমান সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বেকার সমস্যা, অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা, দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন, কর্মজীবনে অতৃপ্তি, পারিবারিক জীবনে অশান্তি, জীবনে ব্যর্থতা ও হতাশার ভাব, আর্থিক সমস্যা প্রভৃতি সমাজের সুস্থ জীবনযাত্রাকে ব্যহত করে সমাজকে নানা ব্যাধিতে পূর্ণ করে তোলেছে (সেনগুপ্ত ২৭৭)।

যেহেতু আত্মহত্যা একটি সামাজিক ব্যাধি তাই এই ব্যাধির জন্য প্রথমেই আমাদেরকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর নজর দিতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোমলমতি এ সব শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার পথ থেকে ফেরাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে নিয়োগ দিতে হবে পর্যাপ্ত সংখ্যক ছাত্র-উপদেষ্টা। নিয়মিত তাদের কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মোহিত কামালের মতে, প্রাণবন্ত তরুণরা যখন হয়ে উঠছেন আত্মঘাতী তখন তাদের কাউন্সেলিংয়ের পাশাপাশি মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম চালু রাখতে হবে। এছাড়া দৃঢ় করতে হবে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকান্ডে যুক্ত হয়, সেজন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি, স্ট্রেস, প্যানিক, ফোবিয়া, মনযৌন সমস্যাসহ বেশ কিছু মানসিক সমস্যা বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে দেখা যায় বেশি। বিষণ্নতার কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন- প্রত্যাশিত একাডেমিক পরিবেশ ও জীবনমান না পাওয়া, বিশেষক্ষেত্রে কিছু শিক্ষকের বিমাতাসুলভ ও বৈষম্যমূলক আচরণ, ক্যারিয়ার নিয়ে অনিশ্চয়তা, আর্থিক সামর্থ্যের অভাব, একই শ্রেণিতে বারবার পুনঃভর্তি হওয়া, খারাপ সিজিপিএ, প্রেমঘটিত সমস্যা, নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে না পারা ইত্যাদি। বিষণ্নতা ও হতাশাকে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার মূল কারণ হিসেবে মনে করে অধ্যাপক কামাল উদ্দিন। এ কারণে কাজের ধরণ এবং চাপও অনেক বেড়েছে। একই সঙ্গে সম্পর্কের ধরণও বদলেছে। এসবকে কেন্দ্র করে নানা জটিলতার কারণে আত্মহত্যা বাড়ছে। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করা। এছাড়া শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত হলে আত্মহত্যার প্রবণতা কমবে (নেওয়াজ ও রবিন ১)।

আঠারো শতকের শেষের দিকে ফ্রান্সের চিকিৎসক ফিলিপ পিনেল (Philippe Pinel) [১৯৭২ সালের দিকে] বিশ্বাস করতেন যে অস্বভাবী ব্যক্তিরা অন্যান্য শাস্তিযোগ্য অপরাধীদের থেকে আলাদা। অস্বভাবী শিক্ষার্থীরা খুব অসহায় এবং তারা মানবিক সেবা পাবার যোগ্য। ফিলিপ পিনেল তাই নৈতিক চিকিৎসার কথা উল্লেখ করেছেন। পিনেলকে অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি হতাশাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের প্রতি খুবই যত্নবান হব এবং তাদের সমস্যাবলী গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবো। তাঁর এই নৈতিক চিকিৎসা (moral treatment/counselling) অস্বভাবী আচরণ (Behavior disorder) দূর করার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সাফল্য লাভ করেছিল। এই নৈতিক চিকিৎসাই মানসিক হাসপাতাল (mental hospital) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আগ্রাসী ভূমিকা পালন করে। এই গবেষণায় এটাই প্রতীয়মান যে, শিক্ষার্থীদের অবসাদ, হতাশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নৈতিক চিকিৎসার প্রয়োজন এবং প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সমস্যা থেকে উত্তোরণের জন্য আলাদা একটি কর্ণার (corner) তথা কাউন্সিলিংয়ের জন্য আচরণ চিকিৎসা (Behavior theraphy) কর্ণার বা মেডিকেল সেন্টার স্থাপন করা প্রয়োজন।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বুলিং-র‍্যাগিং:

নতুন জীবনের আশা নিয়ে প্রতি বছরই দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় অসংখ্য শিক্ষার্থী। বিভিন্ন অঞ্চল বা ক্ষেত্র থেকে আশা শিক্ষার্থী, ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেই তারা একটি শব্দের সাথে অতিমাত্রায় পরিচিত হতে থাকে। সেটি হলো র‍্যাগিং। এটাকে অনেক সময় পরিচয় পর্বও বলা হয়ে থাকে। ক্যাম্পাসে প্রচলিত নিয়ম-কানুন, আদব-কায়দা শেখানোর নামে তাদের ওপর চালানো হয় মানসিক নির্যাতন। অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতনের ঘটনাও ঘটে।

ইউনেস্কোর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ২৩ শতাংশ শিক্ষার্থী বুলিংয়ের শিকার (আহমেদ ৯)। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুরোনো শিক্ষার্থীদের পরিচিত হওয়ার পদ্ধতিই র‍্যাগিং। একে পরিচিত হওয়া বা ম্যানার শেখানো বলা হয়। হলকেন্দ্রিক এই বিষয়কে 'গেস্টরুম ক্যালচার'ও বলা হয়। নতুন আশা নিয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ। এর সঙ্গে সঙ্গে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে র‍্যাগিং নামক অপসংস্কৃতি। পরিচিত হওয়া বা ম্যানার শেখানোর মধ্যে দোষের কিছু হয়ত নেই। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেটা আর স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। এটি শারীরিক বা মানসিক অত্যাচারের দিকে যায়।

শারীরিক নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে- কান ধরে উঠবস করানো, রড দিয়ে পেটানো, পানিতে চোবানো, উঁচু ভবন থেকে লাফ দেওয়ানো, সিগারেটের আগুনে ছ্যাঁকা, গাছে উঠানো, ভবনের কার্নিশ দিয়ে হাঁটানো, এমন কি দিগম্বর করা পর্যন্ত। মানসিক নির্যাতনের মধ্যে আছে গালাগাল করা, নগ্ন ভিডিও করা, কুৎসা রটানো, নজরদারি করা এবং নিয়মিত খবরদারি করা। গবেষণায় দেখা গেছে এর ফলে অনেক শিক্ষার্থী আতংকে হল ছেড়ে এমনকি ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যায়। এদের মধ্যে আবার কাউকে কাউকে চিকিৎসকের শরণাপন্নও হতে হয়। মূলত, ক্যাম্পাসে আসা নবীন শিক্ষার্থীরাই সর্বদাই র‍্যাগিংয়ের ভয়ে ভীত থাকে। পরিণামে অনেক সময় তা আত্মহত্যাকেও প্রভাবিত করে। বুলিংয়ের মধ্যে রয়েছে- শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে কটু মন্তব্য করা, টিজ করা, বডি সেমিং করা ইত্যাদি। একটা নতুন জায়গায় এসে প্রতিটি শিক্ষার্থীই খুব স্বাভাবিকভাবে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। গবেষণায় র‍্যাগিংয়ের আরো কিছু ধরণ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, র‍্যাগিংয়ের মাধ্যমে বস্তুত নবীনদের শেখানো হয় কীভাবে নিজের পরিচয় দিতে হয়। সে ডিপার্টমেন্টের কততম ব্যাচ, ভার্সিটির কত ব্যাচ, বড়দের সালাম দেওয়া, চার-পাঁচ রকমের হাসি দেওয়া, এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা, ম্যাচের কাঠি দিয়ে উচ্চতা পরিমাপ, কীভাবে এক হাতে পানির ট্যাপ ঘুরিয়ে নৃত্য করতে হয়, বিভিন্ন শব্দ দিয়ে নামতা পড়তে বলা, শীতের সময় খালি গায়ে সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকা বা পুকুরে নামিয়ে রাখার মতো ঘটনা ঘটে। ডিজিটাল এই সময়ে র‍্যাগিংয়ের পাশাপাশি বুলিংও শিক্ষার্থীদের মাঝে এক আতংকের নাম। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক কেন্দ্রিক বুলিংয়ের শিকার হচ্ছে নবীন শিক্ষার্থীরা।

জরিপের তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন:

আমরা আত্মহত্যা সম্পর্কে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের ১০৫০ জন শিক্ষার্থী এবং খুবই সীমিত পরিসরে কিছু স্কুল, কলেজের শিক্ষার্থীর কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে জরিপ চালিয়ে আত্মহত্যা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয় এবং এর নৈতিকতা নিরূপণের চেষ্টা করেছি। এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫০ জন নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীর ওপর জরিপ চালানো হয়েছে। যাদের মধ্যে ৪৫০ জন পুরুষ এবং নারী ৬০০ জন। আমরা বিভিন্ন অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়েছিলাম, যার মধ্যে কলা অনুষদের মোট ৩৫০ জন, বিজ্ঞান অনুষদের ২০০ জন, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ২৮০ জন এবং ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ২২০ জন। এই জরিপের মাধ্যমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতার বিভিন্ন দার্শনিক তথা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কারণসমূহ অনুসন্ধান করা এবং এর ফলাফল ও সম্ভাব্য সমাধানের উপায় বের করা। এই জরিপ কাজে দশ (১০) জন তথ্য সংগ্রহকারী তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

এই জরিপে যারা আত্মহত্যাকে সমর্থন করেছে তারা মূলত বেছে নিয়েছে যে "নিজেকে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যই আত্মহত্যা সমর্থন করা যেতে পারে"। আবার, ৯২.৮৫% পাবলিক বিশ্বদ্যিালয়ের শিক্ষার্থীরা মনে করে আত্মহত্যা সমর্থন করা যায় না। আত্মহত্যার মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজকে অস্থিতিশীল করে তোলে। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর মন্তব্য হলো আত্মহত্যা একটি ঘৃণিত এবং অপরাধমূলক কাজ। মানুষের স্বাভাবিক চিন্তা বিচ্যুতির কারণে একজনের দেখাদেখি অন্য শিক্ষার্থীরাও এ পথে ধাবিত হয়। পরবর্তীতে এটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের অভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের উভয়ের ওপর প্রভাব ফেলে। এসকল ক্ষেত্রে সিংহভাগ শিক্ষার্থী মনে করে আত্মহত্যা একটি সামাজিক ব্যাধি ও মানসিক রোগ। জরিপে একটি বিষয় লক্ষ করা গেছে যে ১% শিক্ষার্থী আত্মহত্যাকে সমর্থন করা যায় কিনা- এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছে, এমনকি কেউ কেউ এখানে নিরবতা পালন করেছে। এসকল প্রান্তিক শিক্ষার্থীরা মূলত আত্মহত্যার ঝুঁকিতে রয়েছে বলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে। এসকল ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষার্থীদেরকে কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে স্বাভাবিক মত প্রকাশের পথে ফিরিয়ে আনতে হবে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জরিপের মাধ্যমে যাদের মধ্যে মানসিক সমস্যা বা পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার দেখা দিয়েছিল এদের সংখ্যা নেহায়েত কম তো নয়ই (৮৫%) বরং তাদের শিক্ষা জীবনে অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিম্নলিখিতি যেসকল মানসিক সমস্যা কোন না কোন সময় দেখা দিয়ে ছিল তাদের জরিপকৃত পরিসংখ্যানিক ফলাফল গ্রাফচার্টে উল্লেখ করা হলো।

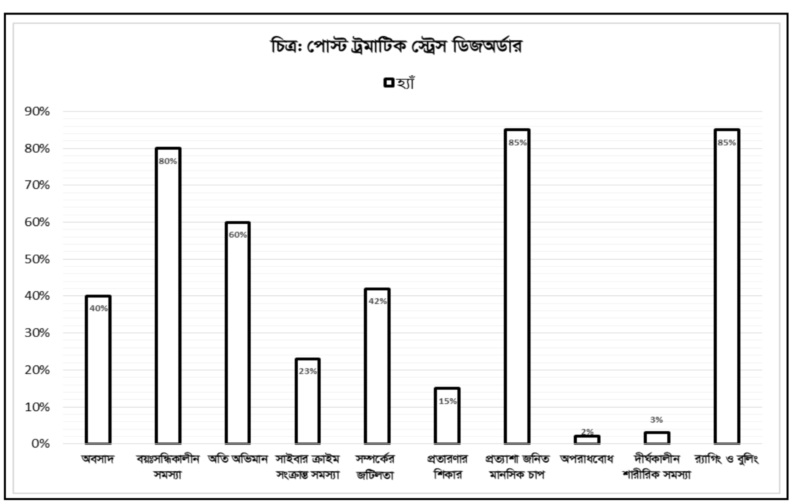

জরিপের মাধ্যমে আমরা দেখেছি ২০২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল ১০১জন; সেখানে ২০২২ সালে আত্মহত্যার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৩২ জন। চলতি বছর (আগস্ট ২০২৩) আত্মহত্যা করে ৩৬১ জন। সম্প্রতি আমাদের গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফুটে উঠেছে, তাহলো- পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডারে ভোগা শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত অভিভাবকের সাথে বিষয়টি শেয়ার না করে তারা একাকী বিষয়টি অনুভব করে। সুতরাং আত্মহত্যার পেছনে বর্তমান প্রজন্মের একাকী থাকাকে দায়ী করা যেতে পারে, এখনকার প্রজন্ম খুব একা থাকতে পছন্দ করে।

একাকিত্ব থেকে তাদের মধ্যে শূণ্যতা দেখা দেয়, শূণ্যতা থেকে হতাশা এবং পরবর্তী সময়ে তারা নিজেদের বোঝা মনে করে। ঐ একাকিত্বের সময় আমরা যদি তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে তাকে ঐ পরিস্থিতি থেকে বের করে আনা যায়। অর্থাৎ

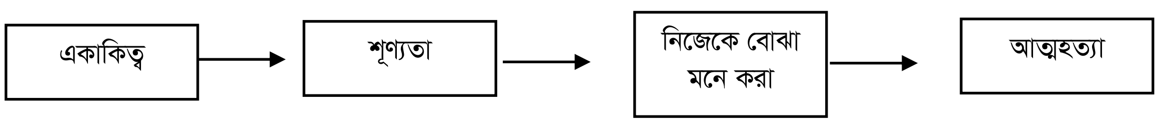

চিত্র: আত্মহত্যা প্রবাহ চিত্র

আত্মহত্যা-সম্পর্কে আঁচল ফাউন্ডেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৩ বিশ্লেষণ:
গত এক বছরে অর্থাৎ ২০২৩ সালে সারাদেশে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫১৩ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করে। ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি, যা ৬০ দশমিক ২ শতাংশ। আর শিক্ষার স্তর বিবেচনায় আত্মহত্যা বেশি স্কুলগামীদের, ৪৪.২%। অভিমান করেই সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী জীবনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এছাড়া, প্রেমের সম্পর্কের টানাপোড়নে পড়ে আবেগের কারণে জীবনের ইতি টানছে অনেক শিক্ষার্থী। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যার ঘটনা ঢাকা বিভাগে।

আত্মহত্যার কারণ গবেষণায় বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে আত্মহত্যার পেছনে সবচেয়ে প্রধান কারণ ছিল অভিমান। অভিমান থেকে ১৬৫ জন বা ৩২% বেশি আত্মহত্যা করে। এছাড়া মানসিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে প্রায় ১০%, পারিবারিক কলহ থেকে ৬%, পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রায় ১% এর বেশি, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে প্রায় ৪%, পড়াশুনার চাপের সম্মুখীন হয়ে ৫%, প্রেমঘটিত কারণে আত্মহত্যা করে প্রায় ১৫%, পাবলিক পরীক্ষায় কাঙ্খিত ফল অর্জনে ব্যর্থ হয়ে প্রায় ২%, যৌন হয়রানির শিকার হয়ে প্রায় ৩% এবং অপমানবোধ থেকে আত্মহত্যা করে প্রায় ১% শিক্ষার্থী। উপরোক্ত তথ্য উপাত্তগুলো নিম্নে গ্রাফচার্টের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো:

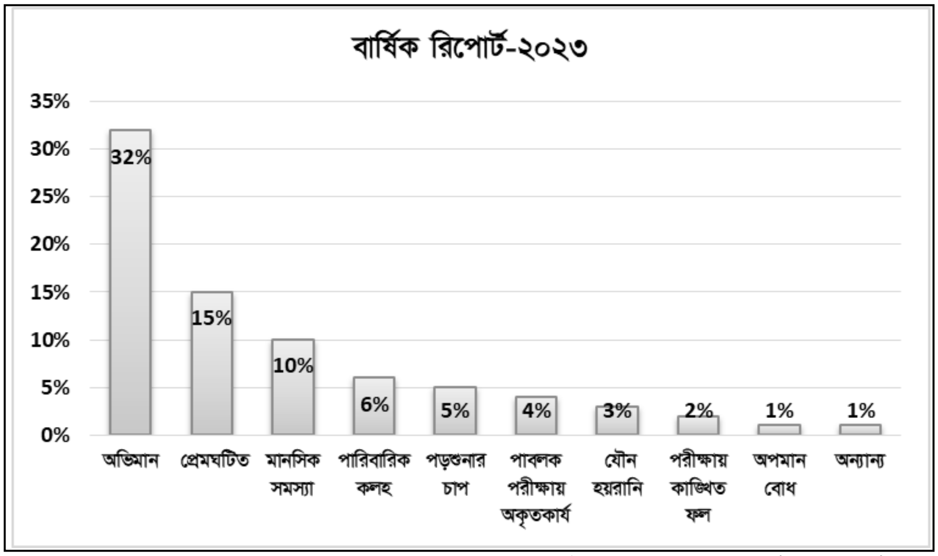

চিত্র: আত্মহত্যার বিভিন্ন কারণের আনুপাতিক হার [উৎস: আঁচল ফাউন্ডেশন বার্ষিক রিপোর্ট-২০২৩,
[https://www.prothomalo.com/bangladesh/5m46ddkd29, date: 27.01.2024, time: 16.14]

গবেষণার প্রতিবেদন মূল্যায়নে দেখা যায়, আত্মহত্যা করেছে এমন ৯৮ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৯ জন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ৫ জন করে শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬ জন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ জন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ জন, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ২ জন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন এবং অন্যান্য ১৫ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে (কবির ৯)। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত গ্রাফচার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

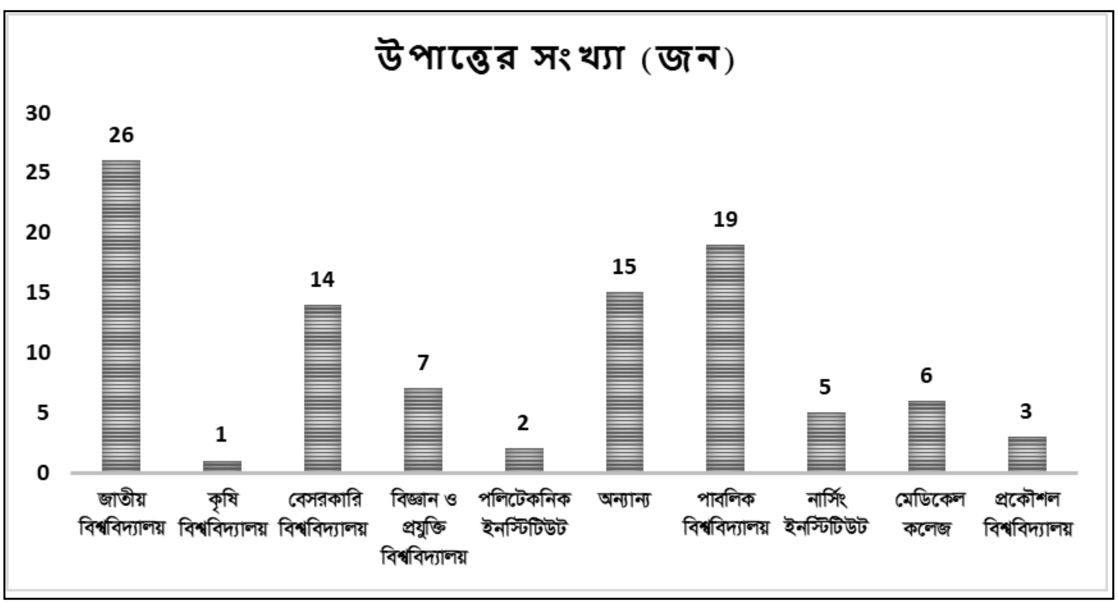

প্রতিবেদনে আত্মহত্যার সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধ স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সব শিক্ষার্থীদেরকে মাসে অন্তত একবার মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য মেন্টর (পরামর্শদাতা) নির্ধারণ করা এবং মেন্টর ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরির পদক্ষেপ নেওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে মানসিক স্বাস্থ্য কর্ণার চালু করা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ গবেষণায় মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা। পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের আবেগীয় অনুভূতি নিয়ন্ত্রণের কৌশল ও ধৈর্যশীলতার পাঠ শিখানোসহ কয়েকটি সুপারিশ প্রতিবেদনে ফুটে উঠেছে।

আত্মহত্যার পূর্ব সংকেতঃ

অনেক সময় আত্মহত্যাপ্রবণব্যক্তি কোনো না কোনভাবে আত্মহত্যা করার আগে কিছু সংকেত দিয়ে থাকেন। এই পূর্ব সংকেতগুলো যদি জানা থাকে তাহলে আগে থেকেই সচেতন হওয়া যেতে পারে এবং শিক্ষার্থীসহ কারও মূল্যবান জীবন বাঁচাতে সহযোগিতা করা যেতে পারে। যেমন- পূর্বসংকেতগুলো হতে পারে এমন- মৃত্যু বা আত্মহত্যা সম্পর্কে কথা বলা, আত্মহত্যা করার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর খোঁজ নেওয়া বা জোগাড় করা (যেমন- ছুরি, কাঁচি, রশি, ঘুমের ঔষধ, বিষ ইত্যাদি)।

'আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর সুইসাইডোলজি'র গবেষণায় আত্মহত্যার জন্য যে সব বিষয় সংকেত (sign) হিসেবে কাজ করে (কবির ৯), সেগুলো হলোঃ

(ক) মৃত্যুসংক্রান্ত কাজঃ যেকোনো কাজে (অংকন, লেখা, ফেসবুক পোস্ট, ক্ষমা চাওয়া, ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা) মৃত্যুর সংকেত থাকা।

(খ) কথাবার্তাঃ যারা আত্মহত্যার চিন্তা করে, তাদের কথায় হতাশা এমনকি সরাসরি মৃত্যুর কথাও প্রকাশিত হয়।

(গ) শারীরিক পরিবর্তনঃ খুব দ্রুত ওজন বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কাঁটা কিংবা ইনজেকশনের সুচের দাগ, যেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে পারবে না বা নীরব থাকবে।

(ঘ) আচরণের পরিবর্তনঃ সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবার কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখে।

(ঙ) চাপমূলক ঘটনাঃ সম্প্রতি পরীক্ষায় আশানুরূপ রেজাল্ট করতে না পারা, ভালোবাসায় ব্যর্থতা, তালাক, হতাশা, চাকরি বা টিউশনি হারানো, অর্থনৈতিক সমস্যা, জটিল শারীরিক সমস্যা প্রভৃতি থাকলে ব্যক্তির আত্মহত্যার পূর্বসংকেত হিসেবে কাজ করে।

আত্মহত্যা প্রতিরোধের পদক্ষেপসমূহঃ

আত্মহত্যাপ্রবণ শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করার জন্য এমনভাবে আমাদেরকে উপস্থাপন করতে হবে যেন বুঝতে না পারে যে সে একা নয়, তার পাশে সহযোগিতার জন্য কেউ আছে। তার কথা গুলো মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তার অনুভূতিগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে। একটা বিষয় গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে, আবেগীয় সমর্থনের পাশাপাশি সুস্থ জীবন-যাপনের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। তাই শিক্ষার্থীদের পরিবার, সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আত্মহত্যা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। যখন কোনো শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যা করার মতো নেতিবাচক চিন্তা আসবে, তখন তার কাছের মানুষ, বন্ধু-বান্ধব, পরিবারের কোনো সদস্য অথবা শিক্ষকদের মধ্যে সেই বিষয়টি শেয়ার করা। পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে-

১. পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব ও কাছের মানুষদের আত্মহত্যা করার আগের ওয়ার্নিং সংকেতগুলো পর্যবেক্ষণ করা ও সচেতন থাকা।

২. যদি কোনো শিক্ষার্থীর আচরণে নিশ্চিত হওয়া না যায় যে, সে আত্মহত্যার চিন্তা করছে কিনা সেক্ষেত্রে তাকে সরাসরি এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা। এতে করে আত্মহত্যাপ্রবণ শিক্ষার্থী তার নেতিবাচক অনুভূতিগুলো শেয়ার করার একটা সুযোগ পেতে পারে এবং আত্মহত্যা প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

৩. শিক্ষার্থী কোনো ভুল করে ফেললে তাকে ভুল ধরানো এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সুযোগ করে দেওয়াও আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৪. প্রতিটি শিক্ষার্থী নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আত্ম-মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি। শিক্ষার্থীর মধ্যে বিদ্যমান ভয়, ঘৃণা, নতজানু আচরণ, ধ্বংসাত্মক মনোভাব প্রভৃতির জন্য বার্ট্রান্ড রাসেল প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা ও অতিরিক্ত আনুগত্যের ফলে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যবহত হয়। বিনষ্ট হয় শিক্ষার্থীর স্বাধীন ইচ্ছা, খেয়াল, কল্পনা ও সৃষ্টির আকাঙ্খা। মন হয়ে পড়ে সংকীর্ণ ও দাসত্বের মনোবৃত্তিতে আচ্ছন্ন (Russell 312)। তাই কোনোভাবেই আত্মহত্যাপ্রবণ শিক্ষার্থীকে তিরস্কার না করা। তার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা ও নমনীয় হওয়া আমাদের নৈতিক আচরণের একটি অংশ।

৫. শিক্ষার্থীর কোনো স্বাভাবিক আচরণের বাইরে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে তাদের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।

৬. খোলামেলা কথা বলে শিক্ষার্থীর সমস্যার বিষয় জানা এবং তা সমাধানের জন্য তাকে সহযোগিতা করা। সংকটময় পরিস্থিতিগুলো মোকাবেলা করার চেষ্টা করা।

৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আত্মহত্যা প্রতিরোধবিষয়ক ও সচেতনতামূলক কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা; এতে করে অনেক শিক্ষার্থীই নিজের উদ্যোগে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা নিতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

প্রাপ্ত-উপাত্তের ভিত্তিতে সুপারিশমালা:

প্রযুক্তির উৎকর্ষ পৃথিবীর গতি–প্রকৃতি বদলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে শিক্ষাক্ষেত্রে। পৃথিবীতে বসবাস করা প্রায় আটশ কোটি মানুষের প্রত্যেকেই একে অন্যের থেকে আলাদা। একইভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী একে অন্যের থেকে আলাদা। সব শিক্ষার্থীর কাছেই সফলতার সংজ্ঞা আলাদা, সবার আত্মতৃপ্তির জায়গাও আলাদা। শিক্ষার্থীর জীবনে একটি পারিবারিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে। প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে নিজেকে সমাজে বিচ্ছিন্ন মানুষ মনে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বা প্রিয় বিষয়ে পড়তে পারা জরুরি, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী নয়। পছন্দের বিষয়ে পড়তে না পারলে জীবন শেষ, এটি ভাবা বোকামি। এটিই জীবন নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া জীবনকে চালানোর একটি উপায় মাত্র। তাই সনদের জন্য নয়, জীবনের জন্য পড়া জরুরি এবং সেভাবে নিজেকে তৈরি করা প্রত্যেক উচ্চ শিক্ষার্থীর নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

I. আত্মহত্যা প্রতিরোধে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে হবে। আমাদের সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার ক্ষেত্রে 'অভিমান' প্রধান কারণ। এ প্রসঙ্গে ড. নাদিন শান্তা মুরশিদ[**] বলেন, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা আত্মহত্যাকে গভীর জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে **১৫** থেকে **১৯** বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। তাঁর মতে, আমাদের শিক্ষার্থীদের অভিমান আমাদের প্রতি- আমরা যারা মা-বাবা, অভিভাবক, রাজনীতিবিদ, পুঁজিবাদী, পাড়ারলোক, দেশের নেতা তাদের প্রতি। আমরা তাদের জন্য যে জীবন, যে বিশ্ব তৈরি করেছি, তাতে তারা সন্তুষ্ট নয়। আসলে পুঁজিবাদী সমাজে উন্নতি করতে পারার সীমা কিছু মানুষের জন্য খাটো থেকেই যাবে। কারণ এটাই পুঁজির নিয়ম। এসব কারণেই শিক্ষার্থীর মধ্যে দিচ্ছি নির্দয়তা ও নিসঙ্গতার জীবন। এসবই শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যাকে উস্কে দিচ্ছে। তাই, পুঁজিবাদী শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে উদার নৈতিক সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা সাম্প্রতিক সময়ের দাবি যা শিক্ষার্থীদের নির্দয়তা ও নিসঙ্গতার জীবনকে প্রশমিত করতে পারে।

II. নাদিন শান্তার গবেষণায় দেখা গেছে, অন্তত একজন ভালো বন্ধু থাকলে শিক্ষার্থীরা আত্মহত্যার পরিকল্পনা থাকলেও তা বাস্তবায়নের প্রয়াস রাখে না। তাঁর মতে, যারা অন্য শিক্ষার্থী দ্বারা নিপীড়িত হয়, তাদের মানসিক অবস্থা এক পর্যায়ে আত্মহত্যার দিকে চলে যায়। যেসব শিক্ষার্থীর বন্ধু থাকে, অন্তত একজন হলেও, তাদের মধ্যে নিপীড়িত হওয়ার আশংকাও কম। আত্মহত্যার আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি হলো উদ্বেগ। গবেষণায় দেখা গেছে যারা বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল, তাদের মধ্যে শুধু আত্মহত্যা নিয়ে পরিকল্পনা নয়; বরং প্রয়াসও ছিল। তাই শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা প্রতিরোধে 'ভালো বন্ধু' ও 'মানসিক অবস্থার' দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। এটা কেবলমাত্র বাড়িতে নয়; স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পর্যায়ে।

III. আত্মহত্যা প্রতিরোধে নৈতিক মূল্যবোধের ওপর দৃষ্টি দিতে হবে। কেননা নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে আমরা নানা সমস্যার ভিতর দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছি। নাদিন শান্তার মতে, সবার আকাঙ্খাই এক- যেমন আছি, তার চেয়ে ভালো কীভাবে থাকা যায়। জীবনের পেছনে ছুটছি মানে টাকা পয়সার পেছনে ছুটছি। এভাবেই চলে যাচ্ছে সকলের শখ, সাধ, কাঙ্খিত জীবনের স্বপ্ন। সামাজিক স্ট্যাটাস বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলছি। আমরা নৈতিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে পারছি না। গবেষণায় দেখা গেছে, আমরা মনে করছি, আমাদের ক্রয় শক্তিই আমাদের বাজারের মূল্য ঠিক করবে। এর অর্থ হলো আমাদের মূল্যবোধ পাল্টেছে। অনেকে মনে করেন, আমাদের যে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ ছিল- পড়ালেখা করতে হবে, মানুষ হতে হবে, সৎ হতে হবে- এসব মূল্যবোধ পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় হারিয়ে গেছে। এরকম পুঁজিবাদী বিশ্বে শিক্ষার্থীরা থাকতে চায় না (মানিক ৫)। মনন ও চরিত্র গঠনের জন্য শিক্ষার্থীকে নৈতিকতা সম্পর্কে সঠিক ও পর্যাপ্ত শিক্ষা দিতে পারলে- তার মানসিক গঠন কাঠামোর ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাই, সকলের উচিত নৈতিক মূল্যবোধ ও নীতিশিক্ষার ওপর জোর দেয়া।

IV. সামাজিক মাধ্যমে আত্মহত্যার সংবাদ, ছবি, ঘটনা, পরিবেশনের ধরণ ঝুঁকিপূর্ণ বিষণ্ন জনগোষ্ঠীতে আত্মহত্যার হার বাড়াতে পারে। আত্মহত্যার সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে মিডিয়াকে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা মেনে সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। আত্মহত্যার ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষার্থীরা কোথায় কীভাবে সহায়তা পাবে, সে বিষয়ে তথ্য প্রদান করতে হবে। সংবাদে বিস্তারিতভাবে আত্মহত্যার পদ্ধতির বিবরণও থাকবে না। ছবি, ভিডিও বা আত্মহত্যাকে প্ররোচিত করে এমন বিষয় পরিবেশন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আত্মহত্যার জরিপকার্য বা সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে গবেষক, মাঠকর্মী ও সাংবাদিকেরা নিজেরাও আত্মহত্যার ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে তাদেরও কাউন্সেলিং গ্রহণ করতে হতে পারে।

V. দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সেখানে প্রশিক্ষিত মনোবিজ্ঞানী, মনোচিকিৎসক নিয়োগ দেওয়াও সেবার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে হাতুড়ে মনোবিজ্ঞানী বা আত্মস্বীকৃত মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিলে হিতে বিপরীত হতে পারে। মনে রাখতে হবে এই সেবা কেন্দ্রগুলো মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার পাশাপাশি কিছু কিছু শিক্ষার্থীর জীবন রক্ষায় কাজ করবে, তাই এই পেশাজীবিদের কাজকে হালকা করে দেখার সুযোগ নেই (চৌধুরী ৯)।

VI. যেসকল শিক্ষার্থীরা আত্মহত্যার ঝুঁকিতে আছে, তাদের ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা দিয়ে জীবনের পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। এ ব্যাপারে পরিবারের পাশাপাশি শিক্ষকদেরও সাহায্য করতে হবে। আত্মহত্যার ঝুঁকিতে থাকা শিক্ষার্থীদের সনাক্ত করাও শিক্ষকদের নৈতিক দায়িত্ব। শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার পাশাপাশি নিয়মিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক কর্মকান্ডসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পিয়ার গ্রুপ, ক্লাব, রোভার স্কাউটে যুক্ত রাখতে হবে যেন শিক্ষার্থী কখনও নিজেকে বিচ্ছিন্ন না ভাবে।

উপসংহার:

আত্মহত্যাকে একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে দেখা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা একে গভীর জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্বদ্যিালয়ের শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা বিষয়ে আমরা জরিপ কার্য চালিয়ে এই প্রতিবেদনে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করে আত্মহত্যার প্রবণতার নৈতিক দিকটি বিশ্লেষণ করেছি। উক্ত জরিপের ফলাফল শুধু আশংকাজনক নয়, মর্মান্তিকও বটে। আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে গত এক বছরে প্রায় ৫১৩ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। গড় হিসাবে বলা যায়, প্রতিদিন প্রায় দু'জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যার মাধ্যমে তাদের জীবনের সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটিয়েছে। আত্মহত্যা করেছে এমন ৯৮ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৯জনই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের। এখানে উল্লেখ করা দরকার, গবেষণায় আরও লক্ষ করা গেছে যে, আত্মহত্যা যারা করেছে তাদের মধ্যে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় অর্ধেক। বিষয়টির বাস্তবতা দুঃখজনক হলেও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, অভিমান করে বা রোমান্টিক সম্পর্ক জটিলতার কারণে আত্মহত্যার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট, আর্থিক কষ্ট, পারিবারিক কলহ-নির্যাতন, একাডেমিক জটিলতা, উচ্চাকাঙ্খা, যৌন হয়রানি ইত্যাদি। আত্মহত্যার প্রবণতারোধে শিক্ষার্থীর মধ্যে আবেগ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা আনার ওপর নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আত্মহত্যা প্রবণতারোধে একটি সমাজকে নৈতিক হতে হবে যার মূল লক্ষ্য হবে সামাজিক বৈষম্য, অস্থিরতা, বিচ্ছিন্নতা কমিয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার মানসিক চাপে সব সময় ব্যস্ত থাকে। বছর জুড়ে পরীক্ষা, ভর্তিযুদ্ধ, যোগ্যতা প্রমাণের যুদ্ধতে ভারাক্রান্ত। এসব কারণে গবেষণায় দেখা গেছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। সঙ্গত কারণেই প্রথমত পরিবার থেকেই আত্মহত্যা রোধের প্রচেষ্টা কার্যকর করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকাও থাকবে গুরুত্বপূর্ণ। আজকের শিক্ষার্থী আগামী দিনের ভবিষ্যত। মানব জীবনে উচ্চ রক্তচাপ যেমন একটি 'নীরব ঘাতক ব্যাধি' অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে শিক্ষার্থীর জীবনে আত্মহত্যার প্রবণতা একটি 'নীরব ঘাতক ব্যাধি'। তাই আত্মহত্যার মতো একটি 'নীরব মহামারি' রোধে সরকারি ও বেসরকারিভাবে যথাযথ ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পর শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। অনুমান করা যেতে পারে যে, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সমাজে এমন কিছু ক্ষতিকর কনটেন্ট বা উপাদান তৈরি হচ্ছে বা বাড়ছে, যা আত্মহত্যাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্ররোচিত করছে। আত্মহত্যা প্রতিরোধে এসব উপাদান পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে চিহ্নিত করে তাদের ক্ষতিকর প্রভাব কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। সারা পৃথিবীতে সাংস্কৃতিক শিক্ষার সংকটের কারণে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানাক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকায় জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সমান সুযোগ পাচ্ছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাংস্কৃতিক চর্চার ভিন্নতা শিক্ষার্থীদের আরও পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবীয় গুণাবলীর বিকাশে তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, আস্থাহীনতা, অশ্রদ্ধা, অসম্মান ক্রমান্বয়ে শিক্ষা লাভের পথকে রুদ্ধ করেছে এবং শিক্ষার্থীকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষার সাংস্কৃতিক লক্ষ্যের অভাবে নেশার জগতে পা দিচ্ছে এবং হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ থেকে বিচ্যুত হয়ে আত্মহত্যার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার প্রবণতা প্রতিরোধের জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলোর ওপর গভীর মনোযোগ দিতে হবে। তাই রাষ্ট্র ও সমাজকে আত্মহত্যা প্রতিরোধে দৃশ্যমান দায়িত্ব নিতে হবে; দেশে বিদ্যমান নীতিমালাকে সুপারিশের আলোকে আরো শক্তিশালী করতে হবে এবং এর বাস্তব প্রয়োগ দৃশ্যমান করতে হবে। শুধু নীতিমালা প্রণয়ন নয়, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রচলিত সামাজিক,

রাজনৈতিক ও পারিবারিক রীতিনীতির পরিবর্তনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তাদের মধ্যে মানবতার সংকট দেখা দিলে ভালোবাসার মাধ্যমে মানবীয় গুণাবলী পুনরুদ্ধার করে আত্মহত্যার প্রবণতা থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

*প্রবন্ধটির তথ্য ও উপাত্ত গবেষণা পরিচালনা ও প্রকাশনা দপ্তর, চ.বি.-এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রবন্ধকারের একটি গবেষণা প্রকল্প থেকে নেয়া হয়েছে।

** ড. নাদিন শান্তা মুরশিদ যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব বাফালোর স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্কের সহযোগি অধ্যাপক, তাঁর গবেষণার এলাকা হলো সামাজিক ও রাজনৈতিক সহিংসতা, গার্হস্থ্য সহিংসতা, ক্ষুদ্র ঋণে নারী সম্প্রতি, তিনি অভিবাসী শ্রমিক ও রোহিঙ্গা শরণার্থী নিয়েও গবেষণায় জড়িত।

তথ্যসূত্র

Aristotle. *The Nicomachean Ethics*, Trans. By Thomson. J.A.K. Book 5, Sec.11, 1953.

Durkheim, E. *Le Suicide*, Trans. By John A. (1952), Spaulding and George Simpson, Kegan Paul Publishing, Routledge, 1897.

Hill, Toma Jr. *Autonomy and Self Respect*, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

Hume, D. *Philosophical Works*, Green, T.H. and Grose, T.H. (eds.), vol. II, pp. 406 ff., *Essay on Suicide*1874-1875.

Kant, I. *Fundamental Principles of Metaphysics of Moral*, 1959.

-'Duties towards the Body in Regard to Life' in *Lectures on Ethics*, Trans. By Louis Infield, Harper and Row, 1986.

Kastenbaum, R. J. *Death, Society and Human Experience*, Chartes Merrill Publishing Company, 1986.

Locke, J. *An Essay Concerning Human Understanding*, 1690.

Plato. *Laws*, Trans. By Taylor, A.E. Book 9, 1934.

Russell, B. *Power- A New Social Analysis*, 17th Impression, George Allen & Unwin Ltd, 1957.

আহমেদ, সানজিদা। 'বুলিং-র‍্যাগিং সমাজের দায়', *দৈনিক সমকাল*, ২৬ নভেম্বর ২০২৩।

কবির, জিয়ানুল। 'আত্মহত্যাঃ চিনতে হবে সংকেত, করতে হবে প্রতিরোধ', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ সেপ্টম্বর ২০২৩।

কান্ট, ইমান্যুয়েল। *নৈতিকতার দার্শনিক তত্ত্বের মূলনীতি*। অনুবাদ হাই, আব্দুল সাইয়েদ। বাংলা একাডেমি, ১৯৮২।

খালেক, এ.এস.এম. আব্দুল। *প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা*। অনন্যা প্রকাশনী, ২০০৯।

চৌধুরী, কামাল। 'ভালবাসার অভাবে ঝরে যায় সম্ভাবনা', *দৈনিক সমকাল*, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪।

নেওয়াজ, সাব্বির ও রবিন, ইসলাম মাজহারুল। 'বিশাল সম্ভাবনায় এমন অপমৃত্যু', *দৈনিক সমকাল*, ২৬ আগস্ট ২০২৩।

ফাতেমা, কানিজ। 'তরুণদের আত্মহত্যা প্রবণতা বাড়ছে', *দৈনিক সমকাল*, ১০ সেপ্টম্বর ২০২৩।

বারি, মুহাম্মদ আব্দুল। *নীতিবিদ্যা*, হাসান বুক হাউজ, ১৯৯৫।

মানিক, মাহফুজুর রহমান। 'নির্দয়তা ও নিসঙ্গতাই শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যায় উস্কে দিচ্ছে', *দৈনিক সমকাল*, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪।

সেনগুপ্ত, শ্রী প্রমোদবন্ধু। *সমাজ দর্শন*। দ্বাদশ সংস্করণ, ব্যানার্জী পাবলিসার্স ১৯৮৬।